❖ বাংলার সংস্কৃতিতে চৈতন্যদেবের প্রভাব আলোচনা করো।

তমাল কান্তি পাল

বাংলা বিভাগ, ডোমকল কলেজ।

শ্রীচৈতন্যদেব একজন ব্যক্তি, রাধা কৃষ্ণে নিবেদিত প্রাণ, পরমভক্তই নন, তাঁকে বাংলা সংস্কৃতির একটা মোড় ফেরানো ব্যক্তিত্বরূপে (Epach Making) কল্পনা করা উচিত। ব্যক্তি জীবনে যেমন মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা, ভালোবাসা অর্জন করেছিলেন, তেমন বৈষ্ণব ধর্ম- সাহিত্য- সংস্কৃতি তথা বাঙালির জনমানসে শতকব্যাপী প্রভাব ফেলেছিলেন। অনেকে তাঁর সমকালকে 'চৈতন্য যুগ' নামে চিহ্নিত করেছেন। বাংলার ব্যক্তি নামে যুগের নামকরণ দেখি না। আসলে তাঁর ভক্তিস্নাত প্রেমমূর্তির পাশে সমাজ ভাবনা সমকালীন বাঙালি চেতনাকে কম আলোড়িত করেনি। প্রায়ই পাঁচশ বছর পরে তিনি আলোচনার বিষয়, বিতর্কের বিষয়, এমনকি গবেষণার বিষয়ও হয়ে রয়েছেন। মধ্যযুগের ভারতীয় মনীষা এবং মানবপ্রেমী শ্রেষ্ঠ পুরুষদের মধ্যে তিনি গণ্য হয়েছেন। বাংলায় তাকে নিয়ে সমকাল উত্তর কালে অজস্র কবিতা রচনা করা হয়েছে, তাঁর জীবনী লেখার প্রসঙ্গ হয়ে জীবনী সাহিত্যের সূচনা করেছে, এমনকি গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ, রাধা কৃষ্ণ লীলার পরিশ্রুতির ভূমিকা নিয়েছে, যা ঈশ্বরের প্রেমলীলাকে সঠিকভাবে গ্রহণের চাবিকাঠি বা কুঞ্চিকা। এর নাম 'গৌরচন্দ্রিকা'। একদিকে ঈশ্বরপ্রেমে মগ্ন, ভক্তি প্রচারে পরিব্রাজক 'কৃষ্ণনামে দিই কোল' মানবপ্রেমে মাতোয়ারা মানুষটির জীবন যতটা আকর্ষণীয়, ততটাই প্রভাব ফেলেছে বাঙালির মন- মনন- শিল্প সাহিত্যচর্চায় এমনকি জীবনচর্যাতেও।

"রাধাভাবদ্যুতি সুবলিত তনু" গৌরাঙ্গের প্রত্যক্ষ পরোক্ষ প্রভাবে বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনে যে আলোড়ন ঘটেছিল সে বিষয়ে আলোকপাত করার চেষ্টা করা হবে। শ্রী চৈতন্যদেব গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রবর্তক হলেও এর দার্শনিক এবং তাত্ত্বিক ভিত্তি গঠনে চৈতন্য-পার্ষদ ও চৈতন্য ভক্তদেরও একটা বড় ভূমিকা আছে। শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত আচার্য, গদাধর, শ্রীবাস, রায় রামানন্দ, স্বরূপ দামোদর, বৃন্দাবনের ষড়গোস্বামী (শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীজীব গোস্বামী, রঘুনাথ দাস, রঘুনাথ ভট্ট, ও গোপাল ভট্ট) এঁরা সবাই মিলেই বৈষ্ণবীয় তত্ত্ব-দর্শনকে সুদৃঢ় ভিত্তি ভূমির উপর প্রতিষ্ঠা করেছেন। দ্বাদশ শতাব্দীতে কবি জয়দেব সংস্কৃত ভাষায় রাধাকৃষ্ণের প্রেম অবলম্বনে কাব্য রচনা করে তাঁর পরিচয় দিয়েছিলেন 'মধুর কোমল কান্ত পদাবলী' নামে। শ্রী চৈতন্য দেবের আবির্ভাবের পর তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভাবে এবং তাঁর প্রবর্তিত ধর্মমতের অনুসরণে ভাবে ও রসে বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যে বিস্ময়কর পরিবর্তন ও সমৃদ্ধি ঘটে।

"যদি গৌরাঙ্গ নহিত কি মেনে হইত
কেমনে ধরিত দে।
রাধার মহিমা প্রেমরস সীমা
জগতে জানাত কে।।"

শ্রী চৈতন্যের অনুসরণে বাঙালির মধ্যে বিষ্ণু তথা কৃষ্ণের নাম নিয়ে আন্দোলন শুরু হয়। কৃষ্ণনাম স্মরণ করার, কৃষ্ণকে অবলম্বন করার প্রবণতা দেখা দিয়েছিল। তাই বৈষ্ণবদের মধ্যে কৃষ্ণনাম শ্রবন, কীর্তন, স্মরণ, ও বন্দন এই চারটি উপায়ে তাঁর ভজনা করার চেষ্টা দেখা যায়। সেইজন্য গান বা পদ রচনার প্রয়োজন, তাই কৃষ্ণের লীলা নিয়ে বিভিন্ন পর্যায়ের পদ বা গান রচনার উৎসাহ দেখা দিল। সেই পদ গাইবার জন্য পদ রচনা, বিভিন্ন পর্যায়গান রচনা করার সঙ্গে সঙ্গে বাঙালি বৈষ্ণবদের মধ্যে আরেকটি নতুন ভাবনার উদয় হল, তা হল চৈতন্যের জীবনচরিত রচনা। মানুষের জীবন নিয়ে এই প্রথম লেখকেরা তৈরি করলেন 'চরিত সাহিত্য'। তার অনেকটা যেমন সাধুসন্ত মহাপুরুষদের অলৌকিক আখ্যান, বাকিটা 'বৈষ্ণব তত্ত্ব প্রবেশিকা'(Rudiments of Vaishanav Theology) এবং সাধারণ মানুষের অনুভবী জীবনমালা। এখানে পুরান, দর্শন, ভাগবত এমনকি বৈদিক সাহিত্যেরও সমর্থন বারবার নেওয়া হয়েছে। সংস্কৃতাভিমানী পন্ডিতের জন্য সংস্কৃত শ্লোক ও যুক্ত

করা হয়েছে। কখনও আবার পাঠক বা শ্রোতাকে আকৃষ্ট করার জন্য তত্ত্বের নীরসতাকে ছাপিয়ে সংলাপ, প্রবাদ, বিশিষ্টাতিক বাক্যাংশ, নাটকীয়তা এসেছে। চৈতন্যের কয়েকটি বাংলা জীবনীভক্তের, তত্ত্বজ্ঞের অবশ্য পাঠ্য হয়ে উঠেছে- যেমন বৃন্দাবন দাসের "চৈতন্য ভাগবত", কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর "চৈতন্য চরিতামৃত", লোচন দাসের "চৈতন্য মঙ্গল", জয়ানন্দের "চৈতন্যমঙ্গল"। কোথাও আছে জীবনকে তত্ত্বের আলোয় দেখা, কোথাও আছে উচ্চাবচতার হৃদয়গ্রাহিতা, কোথাও ইতিহাসের নামে গালগল্পের জনপ্রসিদ্ধির ব্যাপকতা। সবসময় যে চৈতন্যজীবন প্রথম থেকে শেষ অবধি একমুখীন হয়েছে, তাও নয়। বৃন্দাবন দাস চৈতন্যের জীবনের একাংশ লিখেছেন। কৃষ্ণদাস চৈতন্য জীবনকে রাধা কৃষ্ণের ঐশ্বরিক প্রেমের অচিন্ত্য পূর্বপ্রকাশ বলে দেখেছেন। অনেকে চৈতন্যদেবের মৃত্যু নিয়ে ভাবিত হয়ে আঘাত জনিত রোগভোগ দেখিয়ে একটা সমাপ্তি টেনেছেন। অর্থাৎ চরিত্রগুলিও একটি বিশেষ ধাঁচে লেখা নয়। এখানে ব্যক্তি মানুষের প্রতি যেমন আগ্রহ আছে, তেমনি জীবন থেকে তত্ত্বে পৌঁছানোর একটা আকৃতি আছে। সে যাই হোক এভাবে আমরা একই সঙ্গে 'সন্ত জীবনী'(Hagiography) এবং 'জীবনী সাহিত্য'(Biography) পেলাম। এগুলি আলাদা বইয়ের সাধ জাগায় না। এদের একত্র পাঠ করা প্রয়োজন। হয়তো লেখকদেরও এরকম মানসিকতা ছিল। আবার এখানে একটা 'কালান্তর'(Time gap) আছে। ফলে চৈতন্য জীবনী সাহিত্যকে একটি ক্যালিডোস্কোপের মতো, বর্ণালী স্রোতের নানান সংশ্লেষণ বিশ্লেষণের মতো দেখতে হবে। এদের মধ্যে কোনটি শ্রেষ্ঠ টানা বিচার করে প্রত্যেকটি একে অন্যের পরিপূরক বলে ভাবতে হবে। তাহলে লেখকদের অভিপ্রায় স্পষ্ট হতে পারে। কীর্তন গান বাংলায় ছিল না তার আগে এটা সত্যি নয়। বরং কীর্তন কে যদি সম্মেলক সংগীত রূপে দেখি তাহলে সুবিধা হতে পারে। চৈতন্য এই গানে যেমন মানুষের মুখের মিছিল গড়েছিলেন, তেমনি ভক্তির জাতপাতহীন নবীন বৈষ্ণবতার সঞ্চারিত করেছিলেন। আবার চৈতন্যের চলে যাওয়ার বহু পরে খেতুরীতে যে বৈষ্ণব ধর্ম সম্মেলন হল, সেখানে কীর্তন গানের পত্র-পল্লব নতুনভাবে উদ্দীপিত হল। একটি মানুষ যিনি জীবদ্দশায় মহামানব রূপে (অর্থাৎ সচল জগন্নাথ) বন্দিত হয়েছেন, তিনি একাই জনমানস ও সাংস্কৃতিকে একটা মোচড়ে যুগত্তীর্ণ করে ফেললেন। ফলে চৈতন্য এখনও সমানে আলোচিত, তর্কের কেন্দ্রবিন্দু। দুচোখে যদি ভক্তির ধারা বয়, তাহলে তিনি রাধা কৃষ্ণের অদ্বয় রূপ, আর চোখে যদি যুক্তির আলো জ্বলে তাহলে তাকে বলতে হয় মানববাদী প্রতিবাদী এক প্রবল সত্তারূপে। চৈতন্য ব্রহ্মবাদে আস্থা না রেখে ঈশ্বরকে ছটি ঐশ্বর্যের আকর মনে করেছেন। তিনি যেহেতু সচ্চিদানন্দ, তাই সৎবিৎ, সন্ধিনী, এবং হ্লাদিনী-এই তার ত্রিধা-শক্তি।

আমাদের দেশে অসামান্য ভক্তকে অবতার বলে গণ্য করা হয়। চৈতন্য পার্ষদ নিত্যানন্দ হলেন বলরামের একালীক অবতার, অদ্বৈত আচার্য বিষ্ণু-মহাদেবের অবতার। চৈতন্যকে ভগবান বলে অনেক ভক্ত একত্র হলেও তার বিরোধী কম ছিল না। বাংলা তখন সুলতানদের অধিকারে। চৈতন্য যে বাংলা ছেড়ে সামান্য ভারত পরিক্রমা শেষে পুরীতে আশ্রয় নিলেন বিরোধিতার প্রাবল্যের জন্য। উড়িষ্যা তখনও হিন্দুরাজ্য। জগন্নাথ দেবের মন্দির, বৈষ্ণবদের নানান মঠ আখড়া তাঁর পক্ষে নিরাপদ ছিল। আবার আরেকটি চৈতন্য কৌশল হল অদ্বৈত নিত্যানন্দকে বাংলায় প্রচারের জন্য রেখে যাওয়া। নিত্যানন্দ তাঁর কাছে থাক আর বারবার অনুমতি চেয়ে প্রত্যাখ্যাত হন। কেননা গুরু শিষ্য ঘনিষ্ঠতার চেয়ে বৈষ্ণব অঙ্গনে জনতার মেলা হবে এটাই চৈতন্য চাইতেন। রায় রামানন্দ চৈতন্যের সাক্ষাৎকার একটা ঐতিহাসিক ঘটনা। নবদ্বীপ লীলায় তিনি কৃষ্ণভাবে বিভোর হতেন- রামানন্দ রাগানুকা ভক্তি মার্গের সঙ্গে পরিচিত হলে তিনি রাধাভাবে দীক্ষিত হলেন। এভাবে চৈতন্যের সাধনার একটা পরিপূর্ণতা ঘটল। সারা উড়িষ্যায় গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম এভাবে সম্প্রসারিত হল। সম্রাট সিকান্দার লোদীর নির্যাতনে মথুরায় তীর্থযাত্রা বন্ধ হল। বৃন্দাবন ধ্বংসোন্মুখ হয়েছিল। চৈতন্যদেবের এই লুপ্ত তীর্থ পুনরাবিষ্কারে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। ভূগর্ভ লোকনাথ স্বামীকে, পরে রূপ সনাতনকে পাঠান। এরা বৃন্দাবন কে বৈষ্ণব তীর্থে আবার রূপান্তরিত করলেন। বাংলার প্রেম ধর্ম ও সংস্কৃতি এভাবে উত্তর ভারতে সম্প্রসারিত হল। আসামে শঙ্করদেব ও মাধবদেব বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করলেন; মণিপুরে ধর্ম ও সংস্কৃতি গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের দ্বারা প্রভাবিত। পূর্ব ভারতের বাকি জায়গাতেও চৈতন্য দ্বারা প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব

ধর্ম প্রসারিত হল। এক গরীব ব্রাহ্মণ সন্তান সাহিত্য সৃষ্টিতে প্রণোদনা নাথ সৃষ্টি করেছিলেন। এখান থেকেই গড়ে উঠল পদাবলী সাহিত্য। চৈতন্যলীলা ও রাধাকৃষ্ণ লীলা এই দুই ভাগে বিভক্ত হলেও এগুলি পরস্পরের সম্পূরক। গোবিন্দ দাস, জ্ঞানদাস, বলরাম দাস, নরহরি সরকার, নরোত্তম দাস, লোচন দাস, বাসুদেব ঘোষ,বৃন্দাবন দাস, ঘনশ্যাম, জগদানন্দ, উদ্দব দাস, যদুনন্দন, রায়শেখর, কবিরঞ্জন এরা বিচিত্র পদাবলী উপহার দিয়েছেন। সেই রসধারা এখনও বিলুপ্ত হয়নি। চৈতন্য প্রভাবে এদেশে ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য কমে। ব্রাহ্মণেরা শ্রদ্ধেয় ছিলেন, ব্রাহ্মণরাও শ্রদ্ধেয় হলেন। বৈষ্ণব সেবা গৃহীদের মহৎকর্ম বলে বিবেচিত হত। হরিভক্তিপরায়ণ শূদ্র কে ব্রাহ্মণেরা ভক্তি করলেন। ক্রমে বৈষ্ণব ভক্তেরা গুরুর মর্যাদাও পেতে লাগলেন। উঁচুজাতের লোকেরা তাঁর কাছে দীক্ষা নিলেন। দেশে জাত পাতের তীব্রতা কমল। অস্পৃশ্য নিম্ন বর্ণের লোকও মানুষ বলে গণ্য হল। নগর সংকীর্তন এ কাজে বিশেষ সাহায্য করেছিল। চৈতন্যের শিষ্টাষ্টকের একটি চন্ডালোহপি দ্বিজ শ্রেষ্ঠ। অনেকে চৈতন্যের সত্তায় ভগবত্তা আরোপ করলেও মানবিকতা তাঁর জীবনে ওতপ্রোত হয়েছিল। প্রথম জীবনে তার রহস্যপ্রিয়তা, তার্কিকতা এবং ও কলহপ্রিয়তা সহপাঠীরা উল্লেখ করেছেন। নিজে শ্রীহট্টের লোক হলেও তাদের ভাষা নিয়ে ঠাট্টাতামাশা করতেন।দিগ্বিজয়কে হারানোর পর তার জীবনে অর্থ খ্যাতির বন্যা বয়েছিল। বিষ্ণুপ্রিয়াকে তিনি ঘুমে আচ্ছন্ন রেখে চলে গিয়েছিলেন তা নয়। বরং নিজের চতুর্ভুজ মূর্তি দেখানোর পর যখন স্ত্রীকে বোঝানো যায়নি, তখন তিনি 'কোলে করি করিলা প্রসাদ'। এই শেষ সাক্ষাৎকার। বিদায় অনিবার্য ধরে নিয়েছেন বিষ্ণুপ্রিয়া। আবার চৈতন্যের আদরের সুখস্মৃতি তার বহু সাধনার ধন হয়ে রইল।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি:-

১. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস- ড. সুকুমার সেন।

২. বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস- সজনীকান্ত দাস।

৩. বৈষ্ণব রস প্রকাশ-ড. ক্ষুদিরাম দাস।

৪. বঙ্গে বৈষ্ণব সাধনা- হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।